ভোরের কাগজ

44

তারিখ MAR. 0 6 2000
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

যেতে যেতে প

এম এ মোমেন

আমিই দিলাম তবুও গাধা ক

স্বাধীনতার পরপর এসএসসি, এইচএসসি ও বিএ, বিকম পরীক্ষা দেওয়ার ধুম পড়ে গেলো। সোনার ছেলেরা, সোনার মেয়েরা এতো কষ্ট করে দেশ স্বাধীন করেছে! বিনিময়ে তারা যদি সামান্য দুএকটা পরীক্ষায় পাসের দাবি জানায়, তা মোটেই বড়ো কোনো আবদার হতে পারে না। সুতরাং পাস তাদের করাতেই হবে। পাস করাতে হলে খাতায় এলেবেলে কিছু একটা লেখালেখি তো থাকতে হবে। সুতরাং নকল করার একটা স্বাধীন সুযোগও সৃষ্টি করতে হবে। সুযোগ সৃষ্টি হলো। আশির দশকের গোড়ার দিকে অবসর প্রস্তুতি ছুটি (এলপিআর) কাটাতে থাকা একজন প্রধান শিক্ষক আমাকে বলেছেন, তাকে এই বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে কোলাবরেটর অ্যাক্টে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে।

তিনি নিজেও শঙ্কিত ছিলেন। সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে একক সিদ্ধান্তে তো আর স্কুল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করতে পারেন না। ১৯৭১ সালে তার স্কুল খোলাই ছিল। তাকে আরো বলা হলো, ম্যাজিস্ট্রেট এলে তাকে আপনার রুমে বসিয়ে চা-বিস্কুট খাওয়াবেন। এ রকম আরো এক হাজার একটা কারণ খাড়া করানো হলো অবাধ নকল এবং গণপাসের পক্ষে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার এই চাপ সৃষ্টি করার কথা নয়, করেছে তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা। স্কুল বা কলেজে বসার জায়গা থাক বা না থাক, পরীক্ষার ব্যবসাটা বেশ ভালোই জমলো। আয়েশে টুপাইস কামানোর এমন মোক্ষম সুযোগ কে হাতছাড়া করে? পরীক্ষার হল পর্যন্ত কষ্ট করে যদি পরীক্ষার্থী বা তার প্রতিনিধি আসতে পারে, তবেই কেল্লা ফতে। সেন্ট পার্সেন্ট পাস। নিদেনপক্ষে '৯৭-'৯৮ পার্সেন্ট তো বটেই। সে সময়ও দুএকজন বেআক্কেল পরীক্ষার্থী যে ফেল করেনি তা নয়। সে সময়কার একটি ছড়ার কয়েকটি লাইনই কেবল স্মৃতিতে আছে, ছড়াকারের নামটি নেই।

বাছুরের পরীক্ষাটি গরু নিজেই দিয়েছে। প্রক্সি যাকে বলে। তারপরও সেই প্রায় সেন্টপার্সেন্টের আমলে বাছুরটি ফেল করে যায়। মনের দুঃখে গরুটি বলেই ফেলে :

বাছুর আমার বেআক্কেল
আমিই দিলাম পরীক্ষাটা,
তবুও গাধা করলো ফেল।

মেডিকেল পরীক্ষাতেও সেই দাবি। নকল করার অবাধ সুযোগ দিতে হবে। সেই সঙ্গে সবাই পরীক্ষায় পাস করবে সেই গ্যারান্টিও। মেডিসিনের একজন অধ্যাপক এ সব অন্যায় আবদারের প্রায় সবই প্রাণের ভয়ে মেনে নিলেন। তারপর তার সামনে হাজির করা হলো এইসব গ্যারান্টির চুক্তিপত্র। তাকে স্বাক্ষর করতে হবে! হুমকিদাতারা কেবল ছাত্র নয়, সঙ্গে আছে ভাড়াটে নেতা, যারা বরেণ্যও বটে এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র। শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষর করলেন না, কিন্তু চিহ্নিত হলেন শত্রুপক্ষ হিসেবে, ট্যাক্টলেস অধ্যাপক হিসেবে। দেশ ছাড়লেন।

অবস্থার উন্নতি হয়নি এমন নয়। একটি বড়ো ধাক্কা দিলেন শিক্ষাবিদ আবুল ফজল। বিএ পরীক্ষায় পাসের হার নেমে এলো সাতে। এর একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়তে দেখা যায়। অন্তত কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, পড়াশোনা কিছুটা হলেও করতে হবে। নতুবা পাস হবে না।

সুষ্ঠু পরীক্ষার জন্য, নকলমুক্ত পরিবেশের জন্য এবং মেধার যথাযথ মূল্যায়নের জন্য সব আমলে সব সরকারই কেবল মুখে মুখে নয়, কাগজে-কলমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জেলায় ও থানায় যে সব নির্দেশনা যায় এর সিকি অংশও যদি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে তা হলেও পরীক্ষার পরিবেশ আমূল বদলে যাওয়ার কথা।

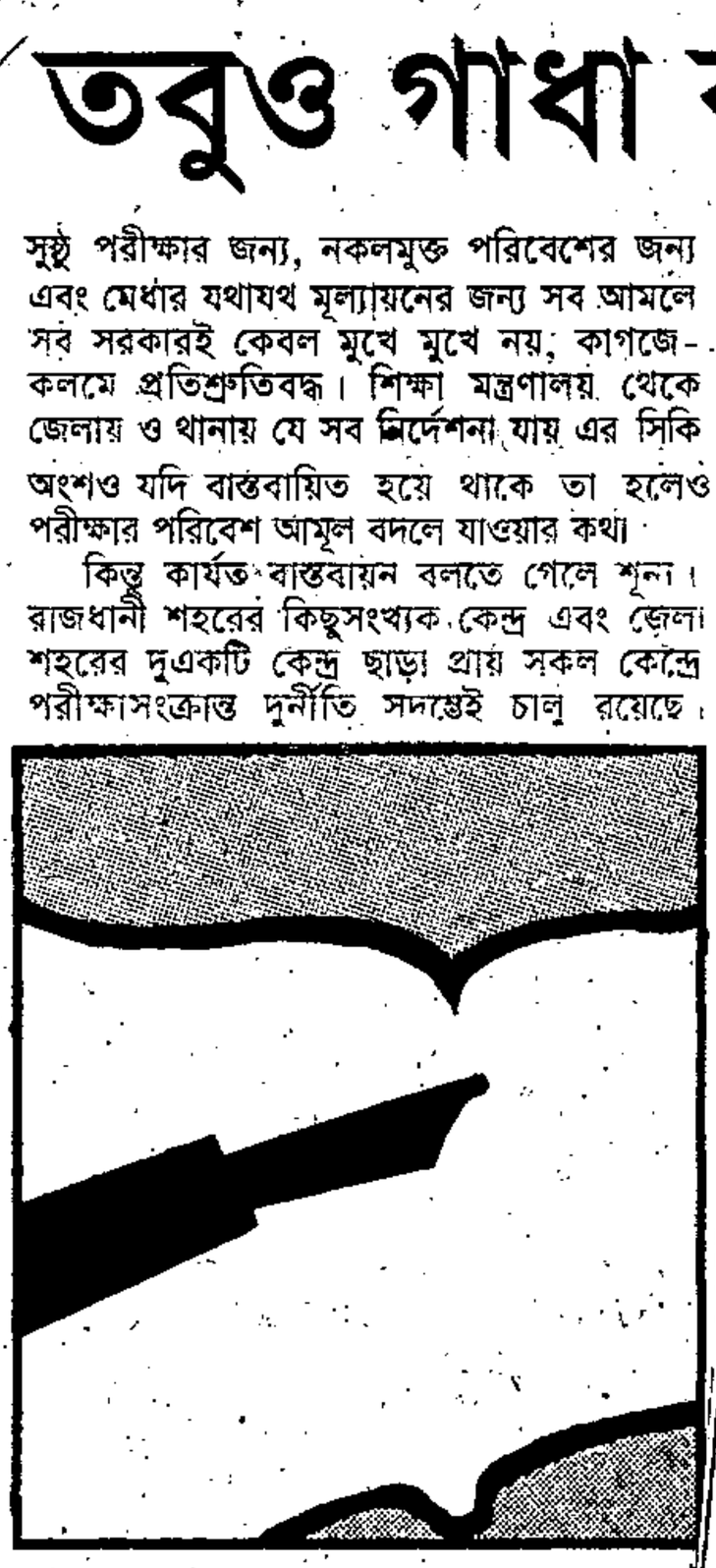

কিন্তু কার্যত বাস্তবায়ন বলতে গেলে শূন্য। রাজধানী শহরের কিছুসংখ্যক কেন্দ্র এবং জেলা শহরের দুএকটি কেন্দ্র ছাড়া প্রায় সকল কেন্দ্রে পরীক্ষাসংক্রান্ত দুর্নীতি সদম্ভেই চালু রয়েছে।

দুর্নীতির মধ্যে নকল তো রয়েছেই, চাপ সৃষ্টি করে ও ঘুষ দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, এখানে পরীক্ষা দেওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে জাতীয় ঘোষণা দিয়ে বিপুল অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য ছাত্রে পরীক্ষায় সুযোগ সৃষ্টি, ছাত্রনেতৃবৃন্দের জন্য সি বেড়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ও প্ররোচণা নকলের অবাধ সরবরাহ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক কলেজের প্রিন্সিপাল কিংবা মাদ্রাসার সুপার বাসায় পরীক্ষার খাতা বদল, বোর্ডের স যোগসাজশে পরীক্ষকের নামধাম জেনে তার

যারা মৃগীরোগের চিকিৎসা নিচ্ছেন না অথচ গর্ভধারণ করছেন তাদের শতকরা ৬ ভাগ ক্ষেত্রে গর্ভ সন্তানের বিভিন্ন পঙ্গুত্ব সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কি করবেন?

যখনই বুঝবেন মৃগীরোগ, তখনই রোগীকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে নেবেন। অনেকে এটিকে জিনে ধরা, হিস্টিরিয়া, ভরকরা, বিভিন্ন ধরনের অন্ধবিশ্বাসের ফল বা পাপের ফল মনে করে। এতে রোগ জটিল আকার ধারণ করে। ফলে চিকিৎসা খরচ বেড়ে যায়। তাই নিজের জ্ঞানে না চলে বা অপরের কথায় প্ররোচিত না হয়ে নিকটস্থ থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন। যেকোনো সাধারণ ডাক্তার এ রোগের চিকিৎসা করতে পারবেন।

রোগ নির্ণয়ে কি কি করা হয়?

সাধারণ রোগী এবং তার আত্মীয়স্বজন বর্ণিত উপসর্গের মাধ্যমে মৃগীরোগ সহজেই নির্ধারণ করা যায়। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পরীক্ষার দরকার নেই। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ডাক্তাররা নিচের পরীক্ষাগুলো করে থাকেন—

- রক্তের বায়োকেমিক্যাল কিছু পরীক্ষা— সুগার, ইউরিয়া হিমোগ্লোবিন ইত্যাদি।
- বুকের ও মাথার এক্স-রে
- প্রস্রাবের স্বাভাবিক পরীক্ষা

এছাড়াও মগজের ইইজি, সিটিস্ক্যান ও এমআরআই করিয়ে নেওয়া যায়।

কি কি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়

কারবামাজিপিন (টেগরেটল, জাপটল), ভ্যালপ্রয়িক এসিড, ইথোসাক্সিমাইড, ফেনোবারবিটন (বর্তমানে ব্যবহার করা হয় না) ক্লোনাজিপাম (রিভোট্রিল), এসিটিএইচ/স্টেরয়েড ইত্যাদি ওষুধ চিকিৎসকদের নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

কতোদিন করতে হবে?

সাধারণত যাদের ক্ষেত্রে একবার খিঁচুনির পরে আর খিঁচুনি হয় না সে ক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহারের দরকার নেই। তবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে খিঁচুনি চলতে থাকে সেসব ক্ষেত্রে ডাক্তার বা খিঁচুনির কারণ, ধরন, রোগীর বয়স ইত্যাদি নির্ণয়সাপেক্ষে ঠিক করে নেন ওষুধ কতোদিন চালাতে হবে। তবে